দুর্নীতি, লোকপাল বিল, আন্না হাজারে ও আমরা

অগ্নীশ্বর চক্রবর্তী

এ নাটক যেন 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। আবার সে 'আসিবে ফিরিয়া'। লোকপাল বিলের কথা বলছিলাম দাদা। দেখুন তো কী কান্ড, বড়দিনের পর শীতটা কেমন চলে গেল – এই মনখারাপের বাজারে ২৮ ডিসেম্বর খানিক খুশি হওয়া গেছিল। সংবিধানিক মর্যাদা না পাক বিল তো পাশ হলো লোকসভায়। ওমা, বছরের একেবারে শেষ দিনে আবার 'যে কে সেই' বিল চলে গেল ঠান্ডা ঘরে। ১৯৬৮ সাল থেকে চলছে এই নিয়ে সবশুদ্ধ ৯ বার একটা দুর্নীতি বিরোধী আইন দূরের কথা বিল-ই পাশ হতে পারল না। দুর্নীতি ও লোকপাল বিল নিয়ে এই গত বছর ধরে নাটকটাও কিন্তু কম হয়নি। জুন-জুলাই মাস নাগাদ। ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের পাতা খুললেই কেন্দ্রীয় স্তরে নানান দুর্নীতির কথা আমাদের চোখে পড়তো। আজ জমি কেলেঙ্কারিতে কর্নাটকের মন্ত্রী পদত্যাগ করছেন তো কাল কমনওয়েলথ গেমস দুর্নীতি কান্ডে নাম জড়াচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের। ইউপি-২ সরকারে তিনজন মন্ত্রী শশী থারুর (আইপিএল কেলেঙ্কারি), আন্দিমুথু রাজা (টু-জি স্পেকট্রাম) ও দয়ানিধি মারান (রিলায়েন্সকে অবৈধ সুবিধা) পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কপিল সিব্বাল, চিদাম্বরম, কানিমোঝি, মুরলী দেওরা (এমন কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও)—এর মতো মহারথীদের নাম জড়াল। মিডিয়ার বেশির ভাগটা জুড়ে থাকতো দুর্নীতির খবর। বাসে, ট্রেনে, ডোভার লেনে সর্বত্রই চায়ের সাথে মুচমুচে দুর্নীতি। এরই মাঝে সাধারণ মানুষের নয়নের মণি হয়েছিলেন, প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা আন্না বাবুভাই হাজারে। তিনি ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা, যারা মিডিয়ার ভাষায় 'টিম আন্না' বলে পরিচিত। তারা নাকি ভারতবর্ষে দুর্নীতি উচ্ছেদের গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন (মানে এখনো নিচ্ছেন)। মিডিয়া সহ বহু লোকই তাদের সভ্য সমাজ আখ্যা দিয়েছেন। এই তথাকথিত 'সভ্য সমাজ' ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের নিরলস প্রচেষ্টার দৈনন্দিন চালচিত্র নিয়ে দু'একটি কথা দেশের যুব সমাজের অংশ হিসাবে বলাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ঠিক পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে আমাদের দেশে দুনীতি আর আর্থিক কেলেঙ্কারির শুরু। নেতা-মন্ত্রী থেকে পাড়ার মস্তান সকলেই সামিল হয়েছিলেন সদ্যজাত প্রজাতন্ত্রের, অর্থ লুন্ঠনের মহা মিছিলে। ব্রিটেনে ভারতের রাষ্ট্রদূত ভি.কে. কৃষ্ণমেনন সোনাবাহিনীর জিপ কেনা সংক্রান্ত ৮০ লক্ষ টাকার একটি কেলেঙ্কারিতে জড়ান সরকারি কোনো নিয়ম না মেনে। সেই শুরু। সেখান থেকে আর এই ২০১১ পর্যন্ত মোট ৭৩ লক্ষ কোটি টাকা দুর্নীতি আর আর্থিক কেলেঙ্কারিতে নয়ছয় করা হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই ১৯৫৫ সালে কৃষ্ণমেননের উপর থেকে এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত মামলাটি প্রত্যাহার করা হয় এবং তিনি নেহেরু মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীও হন। এই যে ৭৩ লক্ষ কোটি টাকা এ আমার আপনার ট্যাক্স বাদ দেওয়া পয়সা। মানে আমরা যখনই বাজার থেকে কিছু কিনি তা তেল-সাবানই হোক বা বাড়ি-গাড়ি আমরা তার দাম ছাড়াও সরকারের নির্ধারিত ট্যাক্স দিই। এছাড়া আয়কর, জলকর, পুরকর ইত্যাদি তো আছেই এই সব ট্যাক্সের পয়সাই দুর্নীতি আর আর্থিক কেলেঙ্কারির মাধ্যমে ঢুকে পড়ে অন্য কারোর পকেটে। আমার, আপনার রক্ত জল করা পয়সায় ধনী থেকে ধনীতর হয় নেতা, মন্ত্র, আমলা পুঁজিপতিরা। একটা হিসাব কষা যেতে পারে এই নয়ছয় হওয়া ৭৩ লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে। এটা দিয়ে ২ কোটি ৪০ লক্ষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (অর্থাৎ ভারতের প্রতি গ্রামে তিনটি করে), ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দ্রুতগামী সড়ক তৈরি করা যেত যা ভারতের সীমানা বরাবর ৯৭ পাক ঘুরে আসার সমান। এক লক্ষ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তৈরি করা যেত। ২০৭৩টি ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা বিশিষ্ট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা যেত। ৯০টি বিভিন্ন রোজগার যোজনা শুরু করা যেত। তার প্রত্যেকটিতে ৮১ হাজার ১১১ কোটি টাকা খরচ করা যেতো। দারিদ্র্য-সীমার নীচে থাকা প্রত্যেকটি মানুষকে ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা করে দেওয়া যেতে পারত। আরো অনেক কিছু করা যেত যার উদাহরণ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। মানে আমার আপনার জীবনে দৈনন্দিন সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়ে যেত। হয়তো তথ্যগুলো আপনি জানতেন না, কিন্তু প্রতিদিনকার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আপনিও জানেন দুর্নীতি কীভাবে আমাদের দেশে শিকড় গেড়ে বসে আছে। এটা আজকের দিনে এমন একটা সর্বগ্রাসী চেহারা নিয়েছে যে সরকারি অফিসে ঘুষ না দিলে কোনো কাজ হওয়া দুস্কর। ডাক্তার ঘুষ নেও ওষুধ কোম্পানি আর ডাক্তারি পরীক্ষার সংস্থাগুলো থেকে। স্কুল কলেজে ছাত্র ভর্তিতে ঘুষ দিতে হয়, পুলিশ ঘুষ নেয় 'অপরাধী' ধরা বা না নিরপরাধকে ফাঁসাবার জন্য। এগুলো আমাদের সবাইকার জানা। আমরাও এটাও জানি এরা চুনোপুটি, আসল রাঘববোয়ালরা বসে থাকে সমাজের একদম মাথায়। সমাজে অনেক সময় হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সৎ, নিরপেক্ষ বলে দেখাবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাদের কেচ্ছাকেলেঙ্কারিও বহু সময় প্রকাশ্যে এসে পড়ে। নিশ্চয়ই কিছুদিন আগেই বিচারপতি সৌমিত্র সেনের ইমপিচমেন্টের কথা ভুলে যাননি। তবে এই সমস্ত পেশার সঙ্গেই যুক্ত একটা সংখ্যালঘু অংশ থাকেন যারা দুনীতির সঙ্গে যুক্ত নন কিন্তু নীরব থেকে বিষয়টিকে প্রশ্রয় দেবার কারণে শেষ বিচারে হয়ত তারাই দায়ী। আবার উল্টো প্রশ্নটিও আছে, করতেনই বা কী? আইআইটি-র মেধাবী ছাত্র সত্যেন্দ্র দুবে 'সোনালী চতুর্ভূজ' প্রকল্পের দুর্নীতির কথা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানানোয় খুন হন। তার মৃত্যু দিবসকে 'আন্তর্জাতিক দুনীর্তি বিরোধী দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হলেও আজ অবধি খুনীদের কোনও কার্যকরী শাস্তি হয়নি। ফলত দুর্নীতি নিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা রাগ চাপা ক্ষোভ আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। তাই যখন 'কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারলে' (সিএজি)-এর রিপোর্ট থেকে জানতে পারি 'টুজি স্পেকট্রাম' কেলেঙ্কারিতে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকা তখন আর আমাদের বিস্ময় জাগে না। বুঝতে পারি আমাদের চোখের সামনে যা হচ্ছে তা নিতান্তই সামান্য, দুর্নীতির মুল রয়েছে সমাজের উপরতলাতে।

২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে আন্না হাজারে যখন 'India against Corruption' নামক সংগঠন গড়ে তুলে আসরে নামলেন তখন স্বাভাবিক ভাবে, আমাদের ভিতরকার রাগ ক্ষোভগুলোর কারণেই দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। জুলাই-আগস্ট মাসে যা ব্যাপক তুঙ্গে ওঠে। মোমবাতি মিছিল, 'I am, Anna' লেখা টি-শার্ট পরে 'হাজার হাজার' 'আন্না হাজারেরা ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইউপিএ বিরোধী সমস্ত পার্টিগুলো প্রচুর সমর্থন জানালো। প্রচুর সমাজকর্মীরাও এগিয়ে এলেন দুর্নীতি রুখতে। 'টিম আন্না'র কলেবর বাড়তে লাগল। শুধু এক নিন্দুক প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করছিল 'এতো লোক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তো দুর্নীতিটা করছে কে?' পাড়ার বাবুদা, চায়ের দোকানে এক

চাটিতে তাকে চুপ করিয়ে দেয়। মিডিয়া যখন এই আন্দোলনকে 'সভ্য সমাজ' -এর আখ্যান দিয়ে ফেলেছে তখন সত্যি সত্যি এই 'নাগরিক সমাজে'র পক্ষেই আমাদের দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আন্না হাজারের নেতৃত্বে তৈরি হওয়া 'জন লোকপাল' বিলের খসড়াটা একটু নেড়েচেড়ে দেখলাম (এটি বিলটির পূর্বতন সংস্করণ, পরে বেশ কয়েকটি সংশোধনী আরো যুক্ত হয়েছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত)। এই বিল অনুযায়ী রাষ্ট্রের থেকে বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সংস্থা থাকবে যাকে বলা হবে 'লোকপাল'। তারাই আইন তৈরি করবেন। প্রণয়নও করবেন। আবার আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তিও দেবেন। কিন্তু তাদের নির্বাচন করবেন কারা? জনগণ অবশ্যই নয়। কারণ তাঁদের নির্বাচিত নেতা মন্ত্রীরাই তো দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে তাদের নির্বাচন করবেন ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা (ভারতরত্ন বা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া মানুষ), সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতিরা, লোকপাল বোর্ডের বিদায়ী সদস্যরা, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, অডিটর জেনারেল, পার্লামেন্টের দু'টি হাউসের প্রতিনিধিরা। লক্ষ করার বিষয় এটি, এখানে ভারতবর্ষের আমজনতার প্রতিনিধি একমাত্র লোকসভার চেয়ার পার্সন। মজাটা এখানে, প্রতিদিন সম্পদ চুরি হচ্ছে দেশের আপামর জনতার, তাকে আটকাবে যে সংস্থা বা ব্যাক্তিরা, তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মতই কি উপেক্ষা কার হচ্ছে না? ভালো করে উপরের নির্বাচকদের তালিকাটা লক্ষ করে দেখুন এদের দুর্নীতির কথাও আমরা যে হামেশাই শুনতে পাই সে তো আগেই বলেছি। মোদ্দা কথাটা হল আইন প্রণয়নে এবং তাকে কার্যকর করায় আমার আপনার কোনো ভূমিকা নেই। এমনকি 'লোকপাল'-এর বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ আসে তাহলে তাকে অপসারণ করার ক্ষমতা অধিকাংশ ভারতবাসীর থাকছে না, সে কাজটি করবেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের একটি কমিটি। অর্থাৎ আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রইলাম।

এই হতাশার মাঝেই যদি একটু আন্না হাজারের গ্রাম রালেগাও সিন্ধি থেকে ঘুরে আসি, দেখব আন্না নিজের সামরিক জীবনে যে শৃঙ্খলা, যে কঠোরতার মধ্য দিয়ে গেছেন, সেভাবেই জীবন কাটানো তিনি সুস্থ স্বাভাবিক বলে মনে করেন। গ্রামে বিড়ি সিগারেট-এর কোনো দোকান নেই বা হিন্দি সিনেমা চলে না, চললেও তা সন্ত তুকারাম বা সন্ত জ্ঞানেশ্বর -এর মতো ধার্মিক সিনেমা। কেউ অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তিনিও মনে করেন তার শাস্তি পাওয়াই উচিৎ। গ্রামে ২৫ বছর কোনো নির্বাচন হয়নি। পঞ্চায়েত সদস্য প্রত্যেকের অনুমোদন নিয়ে মনোনীত হন বটে, কিন্তু আজ অবধি প্রত্যেকবার আন্নাই তার নাম প্রস্তাব করেছেন। প্রত্যেকটি পরিবার থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়। কারণ আন্নার মত অনুযায়ী, তা নাহলে পাকিস্তান আমাদের দেশ দখল করে নেবে। গ্রাম কিছু উন্নয়ন-পরিকল্পনায় গ্রামবাসীদেগর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে বটে কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই অনুশাসন প্রবলভাবে ব্রাহ্মণবাদী। তার এই গোটা পর্যায়ের আন্দোলনের অস্ত্র ছিল 'আমরণ অনশন', যাকে বহু সমাজতাত্ত্বিক 'শান্তিপূর্ণ বলপ্রয়োগ' বলেছেন। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয় ২০০৩ সালে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে কেন্দ্র করে আমরণ অনশনের হুমকি দেন এবং কিছুদিনের বাদে তদন্তের আশ্বাসে তা তুলেও নেন। ২০০৬ সালে Right to Information Act (2005) আমূল বদলের দাবিতে আমরণ অনশন করেন এবং নামমাত্র বদলের পর তাও তুলে নেন। দুর্নীতি বিষয়ক আন্দোলনের তিনটি পর্যায়ে তিনি কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই প্রথমবার '৯৭ ঘন্টার' আমরণ অনশন (!), দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে এবং তৃতীয়বার রাজ্যসভায় বিল ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও অনশন না করেই ক্ষান্ত হন।

এবার 'টিম আন্না' বলে পরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে যদি একটু চর্চা করি, তাহলে প্রথমেই আসে বাবা রামদেব। একে নিয়ে আমার আর নতুন করে কিছু বলার নেই। এর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি এবং বে-আইনি কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক দিন ধরেই লোকে জানেন। তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দাবিটি ছিল সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকার কারবারিদের নাম প্রকাশ্যে আনতে হবে। এটা ভারতবর্ষে বহু সচেতন মানুষের দাবি। সুপ্রিমকোর্ট-এর বি সুদর্শন রেড্ডি ও এস.এস. নিজ্জর -এর বেঞ্চও কালো টাকা মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সত্যিই যদি সুইস ব্যাঙ্কের সমস্ত কালো টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে তা দিয়ে আমাদের দেশের সমস্ত বিদেশি ঋণ ১৪ বার পরিশোধ করা সম্ভব। যাইহোক এহেন রামদেব যখন অনশনে বসলেন তখন সে বিরোধিতাও সরকারে সহ্য হয়নি। তাকেও বর্বর ফ্যাসিস্ত কায়দায় সরকারকে গুঁড়িয়ে দিতে হয়।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রশান্ত ভূষণ বা কিরণ বেদী, দুর্নীর্তির অভিযোগ এদের নামেও আছে। কেজরিওয়াল এই আন্দোলনে আসা ফান্ড আত্মসাৎ করার ধান্দায় ছিলেন। প্রশান্ত ভূষণ সম্পত্তি কিনে আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন। কিরণ বেদী কর্মজীবনে বহু দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন বলে অভিযোগ। তার মধ্যে নিজের মেয়েকে প্রভাব খাটিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করেছেন, এমন কথা খুব জোরালোভাবে শোনা যাচ্ছে।

পাঠক মাফ করবেন। সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের আন্দোলন বা তার নেতৃত্বকে হেয় করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, সারা পৃথিবী জুড়েই নাগরিক সমাজ পচাগলা রাজনৈতিক দল থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নানান স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও ইতিবাচক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। সমাজ পরিবর্তনের প্রকৃত কান্ডারি শ্রমিক -বিপ্লবী কৃষক সহ মেহনতী আমজনতার লড়াই যখন সেভাবে সংগঠিত নয়, সেই সময় নাগরিক সমাজের আন্দোলন সমাজকে একটা দূর অবধি দিশা দেখাতে পারে। সারা বিশ্ব জুড়েই ২০১০-১১ সালে যে টালমাটাল পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে তার বেশিরভাগটাই নাগরিক সমাজের আন্দোলন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে, কোথাও স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তো কোথাও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের রাজ্যেও ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু আন্না হাজারেদের এই আন্দোলনকে 'সভ্য-সমাজ' বিশেষণে অভিহিত করলে এক বিরাট অংশের লড়াই আন্দোলনকে 'অ-সভ্য' আখ্যা দেবার দ্বৈতদ্বন্দ্বে ঢুকে পড়তে হয়। পূর্বে উল্লিখিত ইতিবাচক আন্দোলন গুলির সাথে এই 'দুর্নীতি বিরোধী' আন্দোলন কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান ছাড়া আদৌ দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করে ফেলা সম্ভব কি? তর্কের খাতিরে যদি ধরেওনি সরকার আন্না হাজারেদের প্রস্তাব মতো লোকপাল তৈরি করলো, তা হলেও যে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হবে তার চরিত্র বর্তমান কোর্টকাছারির থেকে আলাদা হবে কি? এটাই আন্না হাজারেদের সংগ্রামের সবচেয়ে দুর্বলতা। কারণ এখানে ক্ষমতা হাতে থাকবে কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের যাদের জনগণের কাছে জবাবদিহি করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আরো সঠিক ভাবে বললে পুঁজিবাদী সমাজের রাষ্ট্রের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর অর্থের জোরে, পুঁজির জোরে, পুঁজিপতি শ্রেণিরাই আসলে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে

রাখে। দুর্নীতি বিরোধিতা করতে গিয়ে আন্না শুধু নেতামন্ত্রীদের বিরোধিতা করছেন, পুঁজির সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক বিষয়ে তিনি আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। 'লোকপাল' নিয়ে আন্না হাজারে পালে প্রচুর হাওয়া দেওয়া সত্ত্বেও, বিজেপি শাসিত রাজ্য গুজরাটেই লোকায়ুক্তকে অপসারণ করা হয় মোদী ঘনিষ্ঠ আমলার বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য। প্রতিদিনকার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝি যে 'কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্ত তাই বিজেপি এখন উদ্ধারকর্তা' –এই যুক্তির আদপেই কোনো মানে হয় না। বড়ো রাজনৈতিক দল, বড়ো জমিদার, বড়ো কর্পোরেট পুঁজির মালিক, পুলিশ, প্রশাসন, মিলিটারি, আমলাতন্ত্র–এই সব মিলিয়েই শাসক শ্রেণি। যারা প্রত্যেকদিন শোষণ করে চলে আপামর খেটে খাওয় মানুষকে। ফলে শুধু দুর্নীতি নয়, সমাজের নানা অন্যায়, শোষণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন সহ গোটা ব্যবস্থাটাই এরা টিকিয়ে রাখতে চায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই যখন এই সবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিক্ষোভ তৈরি হয় তখন তাকে একটা চৌহদ্দির মধ্যে আটকে ফেলার জন্যই ত্রাতার ভূমিকায় হাজির হয় মিডিয়া, সমাজসেবামূলক এনজিও সহ, আন্না হাজারেদের তথাকথিত নাগরিক ও সভ্য সমাজ। ক্ষোভ বিক্ষোভগুলো আজকের দিনে এতোটাই বাড়তে শুরু করেছে যে, যাতে তা গোটা শাসন ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে না চলে যায় তাই গোটা শাসন ব্যবস্থাটার বেশ কিছু সংস্করণ সাধন করার চেষ্টা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। টি. এন. শেষনের হাত ধরে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার বা টাটা কোম্পানি 'জাগো রে' ব্যানারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার সবটাই এই সংস্কারের লক্ষ্যে। হতে পারে সম্পূর্ণ অসচেতনভাবেই আন্না হাজারেরা এর অংশ হয়ে পড়ছেন। আজ থেকে ১৫০ বছরেরও বেশি আগে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাঁদের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-র 'রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া' সমাজতন্ত্র অনুচ্ছেদে বলেছিলেন– 'বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটা ক্রমাগত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণির একাংশ সামাজিক অভাব অভিযোগের প্রতিকার চায়।

এই অংশের মধ্যে পড়ে অর্থনীতিবিদরা, লোকহিত ব্রতীরা, মানবতাবাদীরা, শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার উন্নয়নকারীরা, দুঃস্থ -ত্রাণ সংগঠকরা, পশু-ক্লেশ নিবারনী সভার সদস্যরা, মাদকতা নিবারণের গোঁড়া প্রচারকেরা, সম্ভবপর সরবকম ধরনে খুচরো সংস্কারকেরা।"

মালিকশ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিবাদের উত্থানের প্রথম যুগেই যদি তারা একথা বলে যেতে পারেন, তবে আজকের দিনে তার কী অবস্থা হতে পারে একবার ভেবে দেখুন। গরিবি, বর্ণ বিদ্বেষ, পরিবেশ ধ্বংস বা দুর্নীতির আসল কারণ যে পুঁজিবাদ–এই সংস্কারকেরা সচেতন বা অ-সচেতন ভাবে তাকে আড়াল করেন। বিপ্লবী পরিবর্তনের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে উৎখাতের ধারণাকে গুলিয়ে দিতে হাজির করা হয় সংস্কারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের। খুব সূক্ষ্মভাবে চাষ করা হতে থাকে শাসক শিবিরের মতওদর্শগুলিই। এভাবেই বড় বুর্জোয়া, বড় জমিদার এবং তাদের বন্ধু সরকারগুলির 'একটানা অস্তিত্ব' নিরাপদ করে রাখা হয়। অন্না হাজারের আন্দোলনের পিছনে শাসকশ্রেমির একটা অংশের (আমেরিকাও তো তাকে সমর্থন করেছিল) মদত দেওয়ার কারণ কিন্তু একটাই।

আন্দোলনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে আন্না যখন আমরণ অনশনে ব্যস্ত ছিলেন তখন সারা দেশ জুড়ে ১৫৩৮ জন মানুষ অনশন করছিলেন তার মধ্য ৭৭৮ জন প্রত্যক্ষভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ১১ বছর ধরে Armed Force's Special Power Act (AFSPA) তুলে নেবার দাবিতে অনশন করছেন মণিপুরের কবি ও ছাত্রী ইরম শর্মিলা চানু। আদৌ মিডিয়া এগুলোর দিকে নজর দিয়েছে কখনো? কেউ বলতে পারেন ওদের কথা ধরে লাভ নেই, এগুলো ওদের ব্যবসার কৌশল যার 'News value' আছে তাকেই ওরা Highlight করে। না, তা নয়, সে সব ঘটনাকেই , Highlight করা হয় যা এই ব্যবস্থাকে সামান্যতম বিপদে ফেলবে না অথচ একাট 'জাগ্রত বিবেক'-এর ভড়ংবাজিও চলবে। লক্ষ্য করলে দেখবেন এই 'নাগরিক সমাজ' -এর অংশ বলেই পরিচিত মেধা পাটেকর যখন আন্না হাজারের সমর্থনে দাঁড়ান তখন খবরের কাগজের পাতা ভরে যায় ছবিতে, ঠিক তার দু দিন পরেই যখন তিনি মহারাষ্ট্রের গোলিবার বস্তি উচ্ছেদ করে আবাসন বানানোর বিরোধিতা করে অনশনে বসেন, সে খবর আর মিডিয়ার অনুগ্রহ পায় না। এই সময় পর্যায়েই মারুতির শ্রমিকরা একটা বড়ো আন্দোলন করেছেন। গোরখপুর সুতাকলের শ্রমিকরা বড় একটা লড়াই জিতেও নিয়েছেন। আমেরিকার ওয়ালস্ট্রিট, গ্রীস, স্পেন সব সারা বিশ্বে প্রতিবাদী মানুষ বিদ্রোহ শুর করেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিডিয়া স্রেফ চেপে গেছে বা গুরুত্বহীন করেছে সেইসব খবর।

এই লেখাটা লিখতে সময় লাগলো প্রায় তিনঘন্টা, দুটো তথ্য থেকে একটা ছবি হিসাব কষলাম। সাংবাদিক পি. সাইনাথ জানাচ্ছেন ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কৃষক মৃত্যুর সংখ্যা ২,৫৬,৯১০ জন অর্থাৎ এই লেখার জন্য ব্যবহৃত তিন ঘন্টায় ৭ জন কৃষকের মৃত্যু ঘটেছে। আর ২০১০-১১ সালে সরকারের তরফে পুঁজিপতিদের শুধু রাজস্ব ছাড়ের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ কোটি টাকা অর্থাৎ এই গত তিন ঘন্টায় তারা রাজস্ব পেয়েছেন প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। এর সাথে দুর্নীতির কোনো সম্পর্ক আছে কি?